করোনা অতিমারি এবং পুঁজিবাদ

ষষ্ঠ অংশ

জনস্বাস্থ্য ও পুঁজির আগ্রাসন

আপডেট স্টাডি গ্রুপ, ১৬.০৬.২০২০

ভারতে করোনা সংক্রমণের সংখ্যা বিপজ্জনক গতিতে বেড়ে চলেছে। সংখ্যাটা এখন প্রায় তিন লাখ পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি। এক লাখে পৌঁছাতে যেখানে লেগেছিল ১০৯ দিন, এক থেকে দুই লাখে পৌঁছাতে লাগল ১৫ দিন, দুই থেকে তিন লাখে মাত্র ১০ দিন। শুধু মহারাষ্ট্রেই এক লাখের বেশি সংক্রামিত। (সূত্র ১) দিল্লি, তামিলনাড়ু, গুজরাটের অবস্থাও অত্যন্ত উদ্বেগজনক। যে গতিতে ভারতে সংক্রমণের সংখ্যা বাড়ছে তার ফলে শীর্ষস্থানীয় আমেরিকা-ব্রাজিলকে ধরে ফেলা এখন বোধহয় সময়ের অপেক্ষা। সমগ্র বিশ্বেও সংক্রমণের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। কিছু দেশে সংক্রমণের হার কমলেও বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, প্রথম ধাপের পর দ্বিতীয় ধাপ আসবে, তারপর হয়তো তৃতীয় ধাপ। (সূত্র ২) ১৯১৮-১৯ সালের তিন ধাপের স্পানিশ ফ্লু অতিমারিতে মারা গিয়েছিল ৫ কোটি মানুষ। করোনা অতিমারির প্রথম ধাপ শেষ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা দেখা দেওয়ার আগেই ইতিমধ্যে চার লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজারেরও বেশি মানুষ মারা গিয়েছে। সংক্রমণ ও মৃত্যু এখন অনুন্নত তথা গরিব দেশগুলিতেও হানা দিয়েছে। অনুন্নত দেশগুলিতে উন্নত দেশগুলির তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি। জনঘনত্বও বেশি। তাই, সংক্রমণ আরও ভয়াল চেহারা নিয়ে গরিব-অনুন্নত দেশগুলিতে হানা দিতে থাকলে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সম্ভবত তা অনুমানের বাইরে।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হল এত বিশাল মাপের বিপর্যয়কে মোকাবিলা করার মতো প্রস্তুতির ব্যাপক পরিমাণ অভাব। 'তৃতীয় বিশ্ব' নামে পরিচিত অনুন্নত গরিব দেশগুলির স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর দুরবস্থা তো আছেই। এমনকি উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি, যারা অতি-উন্নত বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়েছে, যারা অত্যাধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সাহায্যে প্রবল প্রতাপে সমগ্র দুনিয়ার উপর স্বয়ংক্রিয় যুদ্ধাস্ত্রের আস্ফালন দেখাচ্ছে, যারা চাঁদে-মঙ্গলগ্রহে উপনিবেশ স্থাপনের আগ্রহে মহাকাশযান পাঠায়, তারাও এখন কত অসহায়! বস্তুত, মুনাফার উদগ্র লালসা মেটানোর তাগিদে তারা ভাইরাস-ব্যাক্টেরিয়া-পরজীবীর বিরুদ্ধে বর্মব্যবস্থা গড়ে তোলাকে পিছনের সারিতে ফেলে রেখেছে। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিরিশ জন বিজ্ঞানী বিপজ্জনক ভাইরাসগুলির একটি তালিকা বানিয়ে সবাইকে সতর্ক করতে চেয়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থার প্রধান পিটার ডাসজাক নিউ ইয়র্ক টাইমসকে জানিয়েছেন, ''সমস্যাটা এটা নয় যে প্রতিরোধ করা অসম্ভব ছিল। তা খুবই সম্ভব ছিল। কিন্তু আমরা তা করিনি। সরকারগুলো ভেবেছে এটা খুবই ব্যয়বহুল। ওষুধ কোম্পানিগুলো মুনাফা কামানোতে ব্যস্ত।'' (সূত্র ৩) গণ স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বিপুল মাত্রার অবহেলা ও গাফিলতি, প্রস্তুতির একান্ত অভাব, মুনাফার অগ্রাধিকার, ইত্যাদি যে প্রণোদনা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে চালিত করে সেখানে মানুষের জীবন তো নিতান্তই তুচ্ছ!

করোনা অতিমারিকে প্রতিহত করার জন্য 'হু' সহ নানা দেশী-বিদেশী স্বাস্থ্যসংস্থা এবং সরকারগুলি জনসাধারণকে যে ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করার নিদান দিয়েছে, বাস্তবে তা প্রয়োগ করা কতটা সম্ভবপর তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বাহুল্য নয়। বিশেষজ্ঞ-মন্ত্রী-আমলারা বলে দিলেন – ঘরের বাইরে বেরোলে প্রতিটি মানুষকে মুখাবরণী পড়তে হবে, দিনে অন্তত দশবার কুড়ি সেকেন্ড ধরে সাবানজলে হাত ধুতে হবে, স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে, প্রত্যেকের মধ্যে অন্তত এক মিটার ব্যবধান রাখতে হবে, লকডাউন মেনে নিয়ে ঘরে থাকতে হবে, ঘর থেকে আপিসের কাজ করতে হবে, সংক্রমণের ইঙ্গিত দেখা দিলে নিভৃতবাসে (কোয়ারান্টিনে) যেতে হবে এবং তা নিজেদের বাড়ির মধ্যেই ব্যবস্থা করে নিতে হবে, ইত্যাদি। ভারতের মতো দেশে স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তরা – যারা সংখ্যায় প্রায় পনেরো-কুড়ি শতাংশ – যারা 'শিক্ষিত' ও 'সচেতন' – তারা প্রায় সবাই নতুন ব্যবস্থাকে মেনে নিল ও প্রয়োগে সমর্থ হল। এমনকি ঘর থেকে আপিসের কাজ করাও অনেকের পক্ষে সম্ভব হল। কিন্তু অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষের কাছে এই নিদান একান্তই অবাস্তব এবং অবান্তর। পরিযায়ী শ্রমিকদের কি ভয়াবহ দুরবস্থার মধ্যে ফেলে দেওয়া হল তা আমরা এই নিবন্ধের প্রথম অংশে আলোচনা করেছি। পরে আবারও সে আলোচনায় ফিরে আসা যাবে। প্রকৃতপক্ষে, দেশের এবং অনুন্নত বিশ্বের কোটি কোটি নিম্নবিত্ত

ও গরিব শ্রমজীবী মানুষকে যে ব্যবস্থাবলী গ্রহণের হুকুম দেওয়া হল তা শুধু তাদের কাছে ঘোর অবাস্তবই নয়, তাদের অশেষ দুর্ভোগও বটে।

২০১৯ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট জানিয়েছে, বিশ্বের প্রতি দশ জনের মধ্যে তিন জন (২১০ কোটি) অপরিষ্কৃত জল খেতে বা ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। এর মধ্যে ১৯০ কোটি থাকে গ্রামীণ অঞ্চলে এবং অর্ধেকের বাস নিম্ন-সাহারা (সাব-সাহারান) আফ্রিকায়। এছাড়া, ২৯০ কোটি মানুষের কাছে মৌল পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা (স্যানিটেশন) অধরা; এখনও ৮৯ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে মাঠ-ময়দান ব্যবহার করে। (সূত্র ৪) ২০১৯ সালের 'হু'-এর একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, বিশ্বে ৩০০ কোটি মানুষ সাবানজলে হাত-মুখ ধোয়ার 'বিলাসিতা' থেকে বঞ্চিত। ফলে প্রতি বছর ২ লক্ষ ৯৭ হাজার পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু পেটের অসুখ, কলেরা, হেপাটাইটিস এ, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগে মারা যায়। (সূত্র ৫) বিশ্বের প্রতি তিনজনের মধ্যে একজনের কাছে পরিষ্কৃত বা পরিশ্রুত জল, স্যানিটেশন ও হাইজিন (এককথায় WASH) ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে পৌঁছায় না। ফলে জীবাণুবাহিত রোগে অনুন্নত বিশ্বের মানুষের মারা যাওয়ার সম্ভাবনা উন্নত বিশ্বের তুলনায় ৩০০ গুণ বেশি! (সূত্র ৬)

এ তো হল অনুন্নত বিশ্বের অবস্থা! ভারতের অবস্থা পৃথকভাবে বিচার করলে প্রায় একই রকম শোচনীয় অবস্থা ফুটে ওঠে। গ্রামীণ ভারতের ৫০.৭ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের ২০.২ শতাংশ মানুষের কাছে সাবানজলে হাতমুখ ধোয়ার ব্যবস্থা নেই। গ্রাম-শহর মিলে সর্বমোট ৪০.৫ শতাংশ। (সূত্র ৭) অর্থাৎ করোনা-প্রতিরোধের প্রথম নিদান থেকে প্রায় ৫২ কোটি মানুষ বাদ পড়ে গেল। নীতি আয়োগের ২০১৯ সালের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, দেশের ৮০ কোটি মানুষ এখনও ব্যাপক মাত্রায় জলের অভাবে ভোগে এবং ৭০ শতাংশ মানুষ এখনও অপরিষ্কৃত জল ব্যবহারে বাধ্য হয়। এদের অধিকাংশের কাছে পাইপলাইনের জল পৌঁছায় না। (সূত্র ৮) 'স্বচ্ছ ভারত মিশন'-এর ফলে মাঠে-ময়দানে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার পরিমাণ কমলেও ২০১৮ সালে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের ৪৪ শতাংশ মানুষ এখনও তাতে বাধ্য বা অভ্যস্ত। (সূত্র ৯) সুতরাং অনেক ভারতবাসী এখনও স্বাস্থ্যবিধির আওতার বাইরে। বলা বাহুল্য, উপরোক্তদের অধিকাংশ গ্রামীণ ভারতের শ্রমজীবী।

শহরাঞ্চলের গরিব শ্রমজীবীদের অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ। একটি হিসেবে শহরগুলির ১১ কোটি ১৫ লক্ষ মানুষ বস্তিবাসী। (সূত্র ১০) তারা কীভাবে লকডাউন পালন করছেন? ধরা যাক মুম্বাই শহরের কথা, যার ৪২ শতাংশ মানুষ বস্তিবাসী এবং ৫৭ শতাংশ মানুষ একটি মাত্র ঘরে মাথা গুঁজে বাস করে। মুম্বাইয়ের ধারাভিতে মাত্র ২.৪ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে সাড়ে আট লক্ষ গরিব শ্রমজীবী বাস করে – অর্থাৎ, প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩ লক্ষ ৫৪ হাজার জন। রান্নাঘর সহ একটি ঘর – অনেক ফ্ল্যাটে যেমন থাকে – তার এক-ষষ্ঠাংশ পরিসরে সাত থেকে আট জন মাথা গোঁজে। দশ ফুট বাই দশ ফুট ঘরে ১২ জনকেও বাস করতে দেখা যায়। এক-একটি গণ-টয়লেট ২৫০ জন পর্যন্ত ব্যবহার করে। ইতিমধ্যে দেশের মোট করোনা সংক্রামিত মানুষের মধ্যে ৭০ শতাংশ আছে ১০টি শহরে, যার মধ্যে মুম্বাই এক নম্বরে। (সূত্র ১১) ২৭ এপ্রিল, যখন সংক্রমণের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এতো সংক্রামিত মানুষকে কোয়ারান্টিনে রাখা সরকারের ক্ষমতায় কুলোচ্ছে না, তখন সরকার ঘোষণা করল, এবার থেকে 'হোম আইসোলেশন'-এ থাকতে হবে। ধারাভি সহ দেশের অগুন্তি বস্তিবাসীর কাছে তা নিতান্তই আজগুবি। বস্তুত, দেশের ৮৭ কোটি মানুষের কোনও পৃথক ঘর নেই অথবা একটি-দু'টি ঘরে ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থাও ব্যতিক্রমী নয়। (সূত্র ১২) তাই, ঘন জনবসতি সম্পন্ন বস্তি/ঝুপড়ি/ঘেটোগুলিতে গুণোত্তর শ্রেণিতে কিংবা গোষ্ঠী সংক্রমণ ঘটা অস্বাভাবিক কোনও ঘটনা নয়। 'সামাজিক দূরত্ব', 'শারীরিক দূরত্ব', 'একটি ঘরে একাকী থাকা', 'স্বতন্ত্র টয়লেট ব্যবহার' এসব কথা তাদের কাছে আকাশকুসুম গল্পগাথা। এটাও স্বতঃসিদ্ধ যে, অপরিসীম দারিদ্র্যই হল উপযুক্ত ঘর, শৌচাগার, জল, খাবার, স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত থাকার কারণ। তাই করোনা কোনও শ্রেণি-বহির্ভূত অতিমারি নয়। তার একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি-চরিত্র আছে। করোনা অতিমারিতে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণির সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা ষোল আনা। এরা হল ভারতের ব্যাপক গরিব শ্রমজীবী মানুষ। অথচ ভারতে করোনা ভাইরাস নিয়ে এসেছে পুঁজিপতি-বিত্তবান শ্রেণিরা!

জনস্বাস্থ্য বা জনসাধারণের স্বাস্থ্য-সুরক্ষার প্রাথমিক শর্ত হল: কাজের নিশ্চয়তা, দুই বেলা ভরপেট খাবার, পর্যাপ্ত পরিশ্রুত জল, মাথার উপর এমন একটি পাকাপোক্ত আচ্ছাদন যা আয়লা-আমফানের ধাক্কায় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে না, পাকা শৌচাগার, ঢাকা ও নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় এমন পয়ঃপ্রণালী, লজ্জা নিবারণে পর্যাপ্ত জামাকাপড়, ন্যূনতম-সুলভ-

নিখরচার ওষুধ ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা, সন্তানদের বিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুবন্দোবস্ত, নিজেদের নিরক্ষরতার অবসান, আচার-বিচার ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি, সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়ন, সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার, ইত্যাদি। তালিকাটি বেশ লম্বা। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে বোধগম্য হবে যে সমাজের পুঁজিপতি-জমিদার-ধনী-বিত্তবান শ্রেণিগুলির কাছে এইসব সুবিধা অনায়াসে মেলে। বিত্ত, ক্ষমতা ও আধিপত্যের জোরে উপরোক্ত সুবিধাগুলি তাদের করায়ত্ত। ফলত, জনস্বাস্থ্যের সমস্যাটিও বর্তমান সমাজে শ্রেণি-চরিত্র ধারণ করে। শ্রমিকশ্রেণি সহ সমস্ত নিপীড়িত জনগণ (যার মধ্যে আদিবাসী, অতিশূদ্র, শূদ্র, সংখ্যালঘু জনসাধারণ, পশ্চাৎপদ জাতিসত্বাও আছে) যতদিন উপরোক্ত শ্রেণিগুলির হাতে শৃঙ্খলিত থাকবে, যতদিন শাসক-শোষকশ্রেণিগুলির শাসনব্যবস্থা অটুট থাকবে, ততদিন সাধারণভাবে জনস্বাস্থ্যের সমস্যা সহ নানাবিধ বঞ্চনা-লাঞ্ছনা-নিপীড়ন-শোষণ থেকে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি নেই। অতিমারিতে তারাই বেশি সংক্রামিত হয়, তারাই মরে বেশি।

ভারতের মতো দেশে জনস্বাস্থ্যের সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা অনেক দূরের বস্তু। অন্যভাবে বললে, জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা 'স্বাধীনতা'র পর কোনও সরকারই করেনি। ভারতে স্বাস্থ্যখাতে ২০২০ সালে জিডিপি-র মাত্র ১.৬ শতাংশ ধার্য করা হয়েছে – তাও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয়ের বরাদ্দ ধরে। ২০০৮ সাল থেকে শতাংশের হারে প্রায় একই বরাদ্দ বজায় আছে। বরাদ্দকৃত ব্যয়ের মধ্যে স্বাস্থ্যকর্মীদের বেতন, বিভিন্ন স্বাস্থ্যসংস্থা ও হাসপাতালের খরচ, 'আয়ুস্মান ভারত' প্রকল্পে বিমাখরচও ধরা আছে। মোট পরিমাণ ৭০ হাজার কোটি টাকা। 'হু'-এর মতে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ হওয়া উচিত ৩.৫-৪ শতাংশ। ভারত সরকার তার ধারেকাছে নেই। (সূত্র ১৩) উন্নত দেশগুলির কথা না হয় বাদ দেওয়া গেল। ব্রিকস-ভুক্ত দেশ, যেমন, ব্রাজিল স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় করে ৮.৩ শতাংশ, রাশিয়া ৭.১ শতাংশ, দক্ষিণ আফ্রিকা ৮.৮ শতাংশ। এমনকি সার্কভুক্ত দেশগুলির মধ্যেও ভারত খুব একটা ভাল অবস্থানে নেই। আফগানিস্তান খরচ করে ৮.২ শতাংশ, মালদ্বীপ ১৩.৭ শতাংশ, নেপাল ৫.৮ শতাংশ। (সূত্র ১৪) অবশ্য বেসরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্র ধরলে ভারতের স্বাস্থ্যখাতে খরচের পরিমাণ ৩ শতাংশের উপরে গিয়ে দাঁড়ায়।

ভারতে সরকার স্বাস্থ্যখাতে মাথাপিছু প্রতি বছরে ১,২৫৯ টাকা ব্যয় করে। অর্থাৎ মাসে ১০৫ টাকার মতো, দিনে মাথাপিছু মাত্র সাড়ে তিন টাকা – যা দিয়ে দশটা প্যারাসিটামল ট্যাবলেটও কেনা যায় না। (সূত্র ১৫) এই তথ্য থেকেই অত্যন্ত স্পষ্ট যে, চিকিৎসার জন্য সিংহভাগ খরচ গরিব জনসাধারণ নিজেদের পকেট থেকেই করে (অথবা, চিকিৎসার অভাবে রোগে ভুগে মরে)। যেমন, ২০১৭ সালে জনসাধারণ মোট চিকিৎসা খরচের ৫৮.৭ শতাংশ – তারা যতই গরিব হোক না কেন – তাদের নিজের পকেট থেকেই খরচ করেছে (যার মধ্যে পরিবহণ খরচ ও অন্যান্য খরচ ধরা নেই)। (সূত্র ১৬) এর জন্য সঞ্চয় ভাঙতে হয়েছে, ধারদেনা করতে হয়েছে, সম্পত্তি বেচে দিতে হয়েছে, কিংবা রোজগারের বড় অংশ খরচ করতে হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ হল, গরিব শ্রমজীবী জনগণের অধিকাংশ সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় আশানুরূপ চিকিৎসা না পেয়ে বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিং হোমের শরণাপন্ন হয়েছে। শহরের ৬১ শতাংশ ও গ্রামের ৫২ শতাংশ মানুষ বেসরকারি হাসপাতালের দ্বারস্থ হয়েছে। শহর-গ্রাম মিলে মোট জনসংখ্যার ৪২ শতাংশ সরকারি হাসপাতালের উপর নির্ভর করে। (সূত্র ১৭) দেখা গেছে, প্রতিটি পৃথক অসুখের জন্য সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় খরচ পড়ে গড়ে ৪,৪৫২ টাকা, বেসরকারি ব্যবস্থায় ৩১,৮৫৪ টাকা – অর্থাৎ ৭.২ গুণ বেশি। (পূর্বোক্ত) অর্থাৎ, সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রতি আস্থা হারিয়ে বেসরকারি হাসপাতালের উপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে। এটা ঘটতে পেরেছে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ক্রমশ খাটো করে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেসরকারি পুঁজির রমরমাকে উপর্যুপরি মদতের ফলে। একটি হিসেবে প্রতি বছর চিকিৎসা বাবদ খরচ করতে গিয়ে প্রায় ৬.২ শতাংশ মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নীচে নেমে যায়। (সূত্র ১৮)

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় এতটাই স্বল্প যে রুগী পিছু হাসপাতাল শয্যা, ডাক্তার, নার্স, অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী, আইসিইউ বেড, ভেন্টিলেটরের সংখ্যার খুবই করুণ দশা। গরিব মানুষের প্রাথমিক চিকিৎসা হয় যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে তার দশটার মধ্যে ছটা চলে একজন মাত্র ডাক্তার দিয়ে। (সূত্র ১৯) 'হু'-এর মতে প্রতি ১০০০ জনের জন্য এক জন ডাক্তার প্রয়োজন। অথচ ভারতে প্রতি ১০,১৮৯ জনপিছু একজন ডাক্তার আছে – মোট ডাক্তারের অভাব ৬ লক্ষ। নার্স দরকার আরও ২০ লক্ষ। (সূত্র ২০) মনে রাখতে হবে, এই হিসেব সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্র ধরে করা হয়েছে। করোনা অতিমারি মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে সরকারি পরিকাঠামো কতটা দুর্বল ও ভঙ্গুর তা ধরা পড়ে কেন্দ্রীয় সরকার-কৃত সাম্প্রতিক এক সমীক্ষা থেকে। মধ্যপ্রদেশের পান্না জেলায় একটি মাত্র ভেন্টিলেটর আছে এবং সেখানে কোনও বেসরকারি হাসপাতালও নেই। অরুণাচল প্রদেশের দিরাং উপত্যকার নিকটবর্তী করোনা পরীক্ষাকেন্দ্র আছে ৩৭৯ কিলোমিটার দূরের ডিব্রুগড়ে। অসমের ডিমা হাসাও, নলবাড়ি ও উদালগুড়ি জেলায় সরকারি হাসপাতালে কোনও ভেন্টিলেটর নেই। (সূত্র ২১) পূর্ব

উত্তরপ্রদেশের বারাণসী ও গোরখপুরকে বাদ দিয়ে ১৭টি জেলায় মাত্র একটি করোনা নির্ণয়কারী পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। (সূত্র ২২) বস্তুত, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার সিংহভাগ বেসরকারি হাসপাতালে কেন্দ্রীভূত। একটি হিসেব অনুযায়ী, প্রতি পাঁচজন ডাক্তারের চারজন, হাসপাতালের শয্যাসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ, এবং ৮০ শতাংশ ভেন্টিলেটর বেসরকারি হাসপাতাল-নার্সিং হোমে কেন্দ্রীভূত। অথচ এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রামিতদের মাত্র ১০ শতাংশ চিকিৎসা করেছে বেসরকারি হাসপাতাল এবং অবশ্যই অত্যন্ত উচ্চ মূল্যের বিনিময়ে। (সূত্র ২৩) বস্তুত, মুম্বাই-দিল্লির মতো শহরও জানাচ্ছে করোনা চিকিৎসার জন্য তাদের হাতে যথেষ্ট হাসপাতাল বেড নেই, নেই যথেষ্ট ডাক্তার, কিংবা নার্স। এমনকি মাস্ক, পিপিই, স্যানিটাইজারেরও আকাল বিভিন্ন রাজ্যে লক্ষণীয় মাত্রায় চোখে পড়ছে। 'হু' প্রথম থেকে করোনা রোগ নির্ণয়ের জন্য যে টেস্টিং-এর উপর ব্যাপক জোর ফেলেছে, প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই দেখা গেছে তার ব্যবস্থার যথেষ্ট অভাব। যথাযথ মাত্রায় টেস্টিং করলে সংক্রমণের সংখ্যা যেমন বাড়ত, অন্যদিকে করোনা মোকাবিলায় তুলনায় অনেক বেশি প্রস্তুত থাকা যেত এমন অভিযোগও শোনা যাচ্ছে। (সূত্র ২৪) এমনকি বেশ কয়েকটি রাজ্যে টেস্টিং-এর মাত্রা কমছে অথচ সংক্রমণের পরিমাণ বাড়ছে এমন দৃষ্টান্তও দেখা গেছে। (সূত্র ২৫) যাই হোক, করোনা সংক্রমণ আরও বহুগুণে বর্ধিত হতে থাকলে এই নড়বড়ে সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় পরিস্থিতি কোথায় দাঁড়াবে তা অতি কষ্টেও আন্দাজ করা যাচ্ছে না।

তবে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা এতটা দুর্বল ও ভঙ্গুর ছিল না। রীতিমতো পরিকল্পনা করে এই অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের অঙ্গ হিসেবে যখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ('হু') গঠিত হয়, তখন থেকেই তা ছিল সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির আজ্ঞাবাহী। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সেনাবাহিনী ও কর্মীবৃন্দকে 'তৃতীয় বিশ্বের' অসুখ-রোগ থেকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক বা ভ্যাক্সিন প্রস্তুতির কাজে 'হু' মনোনিবেশ করে। কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জের থেকে অর্থের প্রাপ্তি ক্রমশ শুকিয়ে যাওয়ার ফলে 'হু' বিশ্বব্যাঙ্কের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ইতিমধ্যে রেগনমিক্স ও থ্যাচারের নেতৃত্বে যে নয়া উদারনৈতিক নীতির আবাহন ঘটে তার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে বেসরকারিকরণ, সরকারি স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় হ্রাস, বেসরকারি বিমাব্যবস্থার হাতে স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ক্রমশ আরও বেশি তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৯৩ সালে বিশ্বব্যাঙ্ক প্রকাশ করে ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট যার শিরোনাম ছিল 'ইনভেস্টিং ইন হেল্থ'। এই নীতির দু'টি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, বিশ্ব স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে আরও বেশি মাত্রায় বেসরকারি পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া, বেসরকারি বিমাব্যবস্থার উপর জনসাধারণকে নির্ভরশীল করে তোলা এবং বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি, পরিষেবা-প্রদানকারী ও যন্ত্রাংশ প্রস্তুতির কোম্পানিগুলির জন্য এক বৃহৎ বাজার গড়ে তোলা। দ্বিতীয়ত, তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যকে অধিকতর উন্নত করা যাতে উৎপাদনশীলতা বাড়ে। (সূত্র ২৬) 'তৃতীয় বিশ্বে' রোগ নিয়ন্ত্রণ করে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য যে কাজ রকফেলার ও কার্নেগি ফাউন্ডেশন করছিল, তার দায়িত্ব নিল 'হু' (প্রায় সমজাতীয় উদ্দেশ্যে নিয়ে বিল গেটস ও মেলিন্দা ফাউন্ডেশন এখন 'হু'-র অন্যতম অর্থদাতা)। বিশ্বব্যাঙ্ক ও 'হু'-র নয়া নীতিতে মূল সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হল স্বাস্থ্যকে, দারিদ্র্যকে নয়। দারিদ্র্য যে স্বাস্থ্যহীনতার মূল কারণ তাকে অস্বীকার করা হল। বলা হল, স্বাস্থ্যকে উন্নত করলে দারিদ্র্য কমবে। এই নয়া তত্ত্ব অনুযায়ী 'তৃতীয় বিশ্বের' স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো শুরু হল। বিভিন্ন দেশের সরকারকে বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণব্যবস্থা ও কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের পাঁচন গিলিয়ে স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে প্রথমে সরকারি-বেসরকারি যৌথ ব্যবস্থায় (পি-পি-পি মডেল) নিয়ে আসা হল, পরে পূর্ণ বেসরকারিকরণের দিকে যাত্রা মসৃণ করা হল। (পূর্বোক্ত) ফলে স্বাস্থ্য পূর্ণাঙ্গভাবে পণ্যে পরিণত হল, 'স্বাস্থ্য মানুষের অধিকার' কথাটি বিসর্জিত হল।

১৯৮০-এর দশক থেকে প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের উন্নত দেশগুলির জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের অধীন স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে লক্ষ্যবস্তু করা হল। তারপর দৃষ্টি ঘোরানো হল লাতিন আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার দিকে। ইউরোপে প্রথম দিকে তেমন সাফল্য পাওয়া যায়নি শ্রমিক ইউনিয়নগুলির প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ফলে। কিন্তু ক্রমশ সে প্রতিরোধ দুর্বল হল। স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে ঢেলে সাজানো শুরু হল। (সূত্র ২৭) ১৯৯০-এর দশক থেকে ব্রিটেন, নেদারল্যান্ড, সুইডেন, ইতালিকে স্বাস্থ্যব্যবস্থা সংস্কারের দিকে ঠেলা হল। বিশ্বব্যাঙ্কের প্রচারিত তত্ত্ব হল: ''স্বাস্থ্য হল ব্যক্তিগত বিষয়, স্বাস্থ্যব্যবস্থা হল ব্যক্তিগতভাবে নির্ভরযোগ্য''। (সূত্র ২৮) ব্রিটেনের যে ন্যাশনাল হেল্থ সিস্টেম (এনএইচএস) সুবিখ্যাত ছিল তাকে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে পর্যায়ক্রমে টোরি ও লেবার সরকার ক্রমশ ভেঙে টুকরো টুকরো করে ব্যাপক বেসরকারিকরণের দিকে পা বাড়াল এবং আমেরিকার মডেলে জনসাধারণকে ক্রমশ বেসরকারি বিমা কোম্পানিগুলির উপর

নির্ভরশীল করে তোলা হল। (সূত্র ২৯) ব্রিটেনের বর্তমান স্বাস্থ্যব্যবস্থার এক করুণ চিত্র উপস্থিত করেছে দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকা: 'রোগ নির্ণয়কারী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলি করা হচ্ছে এমন যন্ত্রপাতি দিয়ে যাদের আয়ু শেষ হয়ে গিয়েছে, কেননা নতুন কেনার অর্থ নেই। যেমন, রেডিওলজি বিভাগের স্ক্যানারের আয়ুস্কাল পেরিয়ে গেছে এবং তা যে ছবি দেয় তার থেকে রোগ নির্ণয় কঠিন। অ্যাম্বুলেন্সগুলির ভগ্নদশা কেননা তা বহুকাল ধরে চালানো হচ্ছে। হাসপাতালগুলিতে আদ্যিকালের কমপিউটার ব্যবস্থা রেখে দেওয়া হয়েছে। ভেঙে পড়া জানলা ও ছাদের ফুটো সারাই হয় না কারণ অর্থ নেই।' (সূত্র ৩০) এ যেন ভারতের সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার অবিকল প্রতিচ্ছবি! এই অবস্থায় করোনা মোকাবিলার ক্ষেত্রে ব্রিটেনের সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থার নাকানি-চোবানি খাওয়া বিস্ময়কর নয়।

একই কথা খাটে ইতালির ক্ষেত্রেও। গত তিরিশ বছর ধরে ইতালির স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে যেভাবে ভঙ্গুর করে বেসরকারি পুঁজির উপর নির্ভরশীল করে তোলা হয়েছে, যার ফলে করোনা সংক্রামিত বেশি বয়স্কদের বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা যেন ভবিতব্য ছিল। (সূত্র ৩১) স্পেন, গ্রিসের ইতিহাস মোটামুটি একই। তবে লাতিন আমেরিকার স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেসরকারিকরণ ও জনসাধারণকে বেসরকারি পুঁজির উপর নির্ভরশীল করে রাখার তুলনা মেলা ভার। করোনা সংক্রমণের ফলে পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে ইকুয়েডরের রাস্তায় মৃতদেহের সারি দেখা যাচ্ছে। (সূত্র ৩২)

ভারতের স্বাস্থ্যব্যবস্থার গতিপথ বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসক্রিপশন নির্ধারণ করে দিয়েছিল। ১৯৯০-এর দশক থেকে বিশ্বব্যাঙ্কের 'ইনভেস্ট ইন হেল্থ' তত্ত্ব স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগের রাস্তা খুলে দিল। ক্রমশ সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে শুকিয়ে ফেলা হল, পাশাপাশি পি-পি-পি মডেলে বেসরকারিকরণের রাস্তা মসৃণ করা হল। কাজটা শুরু করেছিল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার। ২০১৪ সালের পর তাকে আরও মজবুত ও আগ্রাসী করে তুলল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। সবার জন্য সবল, সক্ষম ও নিখরচার স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিবর্তে সর্বাত্মক জোর ফেলা হল গরিব জনগণকেও বিমা ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসার উপর। ৫০ কোটি গরিব জনসাধারণের জন্য চালু হল 'আয়ুস্মান ভারত' প্রকল্প, পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা। এই টাকা (বা প্রিমিয়াম) দেবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার – অবশ্যই জনগণের ট্যাক্সের টাকা থেকে। অন্যদিকে মুনাফা লুটবে বড় বড় বহুজাতিক ও বেসরকারি পুঁজি বা বিমা-ব্যবসাকারী। (সূত্র ৩৩) অথচ 'অদৃষ্টের এমনই পরিহাস', ভারতের বেশিরভাবে গরিব মানুষ থাকে গ্রামাঞ্চলে যেখানে বেসরকারি হাসপাতাল নেই।

উপরন্তু, ২০১৭ সালে নীতি আয়োগ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তর একটি নয়া মডেল চালু করার প্রস্তাব দিল। এর মর্মবস্তু হল দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির শহরগুলিতে এবং জেলাগুলির সদর হাসপাতালগুলিকে বেসরকারি স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ৩০ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে হবে এবং ৫০ কিংবা ১০০ বেডের হাসপাতাল নির্মাণের ব্যবস্থা করা হবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারি হাসপাতালের জমি দেওয়া হবে। সরকারি হাসপাতালগুলির অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, ব্লাড ব্যাঙ্ক, ফিজিওথেরাপি পরিষেবা, বায়ো-মেডিকেল পদ্ধতিতে বর্জ্য পদার্থের নিষ্কাশন, মর্গ, পার্কিং ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, সিকিউরিটি ব্যবস্থা, ইত্যাদি যাতে বেসরকারি স্বাস্থ্য-প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবহার করতে পারে তার বন্দোবস্ত করা হবে। বেসরকারি হাসপাতালে যাতে সরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি থেকে রুগীর সরবরাহ নিয়মিত থাকে তারও ব্যবস্থা করা হবে। কোনও ফ্রি বেড থাকবে না। বিশেষত হৃৎরোগী, ডায়াবেটিস ও ফুসফুসের চিকিৎসার জন্য বেসরকারি পুঁজির বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে, ইত্যাদি। (সূত্র ৩৪) আগ্রহোদ্দীপক ঘটনা হল, প্রথমে এনডিএ সরকার ২০১৫ সালে যে স্বাস্থ্যনীতির খসড়া প্রস্তাব এনেছিল, তাতে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বেসরকারি ভূমিকা খর্ব করে সবার জন্য স্বাস্থ্যের কথা বলা হয়েছিল। নীতি আয়োগ এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করে এবং ঘোষণা করে 'বিনা পয়সায় চিকিৎসা: এক উদ্ভট কল্পনা'। তারা আরও বলে, সরকারের অর্থবল ও লোকবলের দিক থেকে তার ব্যবস্থা অসম্ভব। (পূর্বোক্ত) নীতি আয়োগের সমালোচনা গিলে ফেলে স্বাস্থ্যদপ্তর ২০১৭ সালে যে স্বাস্থ্যনীতি ঘোষণা করল তা নীতি আয়োগের নীল নকশা অনুযায়ী রচিত। কিছু পরে নীতি আয়োগ যে মডেল উপস্থিত করে তাতে ডাক্তারি ছাত্রদেরও প্রস্তুত করার ভার তুলে দেওয়া হল বেসরকারি পুঁজির হাতে যেখানে ৫০ শতাংশ আসনের খরচ বাজার দরে নির্ধারিত হবে। বেসরকারি কলেজগুলি জেলা হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে এবং ৭৫০টি বেডের সুপারিশ করা হয়েছে। (সূত্র ৩৫) এই বেসরকারি কলেজগুলি থেকে বিপুল অর্থ ব্যয় করে বিত্তশালী ঘরের ছেলেমেয়েরা যখন ডাক্তার হয়ে বেরোবে তাদের অগ্রাধিকার থাকবে পকেট ভরানো, গরিব জনসাধারণের চিকিৎসা নয়। এটা আদৌ বিস্ময়কর নয় যে নীতি আয়োগ তাদের নীল নকশা প্রস্তুত করার জন্য যে বৈঠকগুলি করেছিল তাতে

উপস্থিত ছিল বিশ্বব্যাঙ্কের স্বাস্থ্যবিষয়ক ও আর্থিক প্রতিনিধিরা এবং বেসরকারি শিল্পপতিরা। সরকারি স্বাস্থ্যবিভাগ থেকে একজন মাত্র নিম্নপদস্থ অফিসার উপস্থিত ছিল। (সূত্র ৩৬)

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় 'জনস্বাস্থ্য' নামক কোনও স্বাস্থ্যব্যবস্থা হতে পারে না। সবকিছুর মতো তাদের কাছে স্বাস্থ্য এমন এক পণ্য যা থেকে কোটি কোটি ডলার মুনাফা করা যায়। স্বাভাবিকভাবে গরিব শ্রমজীবী মানুষ এই মুনাফা-ভিত্তিক স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বলিপ্রদত্ত এক জীব মাত্র। এমনকি উন্নত দেশগুলির ব্যাপক শ্রমজীবী মানুষের কাছেও বিমা-নির্ভর ও বেসরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা হাতের বাইরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে গরিব শ্রমজীবী মানুষরা হল কৃষ্ণাঙ্গ, হিস্পানিক (লাতিন আমেরিকা-জাত) এবং এশিয়ান। কৃষ্ণাঙ্গরা জনসংখ্যার মাত্র ১৩ শতাংশ হলেও করোনার ফলে ২৭ শতাংশ কৃষ্ণাঙ্গের মৃত্যু হয়েছে। (সূত্র ৩৭) ব্রিটেনের চিত্র একই রকম। কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের মধ্যে মৃত্যুহার তো বেশি-ই, এমনকি বাংলাদেশি মানুষ শ্বেতাঙ্গ ব্রিটিশদের থেকে চারগুণ এবং পাকিস্তানিরা তিনগুণ বেশি হারে করোনার ফলে মারা পড়ছে। (সূত্র ৩৮) আমেরিকায় যাদের স্বাস্থ্যবিমা নেই, করোনার ফলে তাদের মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে ২৫ শতাংশ বেশি। (সূত্র ৩৯) পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক যে আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এলার্জি অ্যান্ড ইনফেকশিয়াস ডিজিজ-এর ডিরেক্টর অ্যান্টনি ফাউসি বলেছেন, "আমাদের ঠিক যা দরকার (বর্তমান) ব্যবস্থা তা দিতে পারছে না, প্রকৃত অর্থে পারছেই না।... (ব্যবস্থাটি) ব্যর্থ হচ্ছে, আমাদের স্বীকার করে নেওয়া উচিত।" (সূত্র ৪০) নয়া উদারনীতির প্রবক্তা থ্যাচার বলেছিলেন, "সমাজ বলে কোনও বস্তু নেই"। কিন্তু থ্যাচারের যোগ্য উত্তরাধিকারী বরিস জনসন এখন ঢোঁক গিলে বলেছেন, "সমাজ হল প্রকৃতই একটি বস্তু"। (সূত্র ৪১) স্পেন ও আয়ারল্যান্ড নয়া উদারনীতির খোলস আপাতত ত্যাগ করে বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করছে। বলা বাহুল্য, 'ব্যবস্থাটি ব্যর্থ হচ্ছে' এমন বক্তব্য, কিংবা 'সমাজ'-এর জন্য স্বাস্থ্যব্যবস্থা নিবেদিত এমন কোনও ধারণা আন্তর্জাতিক পুঁজির প্রতিনিধিরা প্রকৃত অর্থে মনে করতে পারে না। পুঁজির সঞ্চয়ন ও মুনাফা যাদের কাছে একমাত্র পাখির চোখ, অতিমারি যতই ভয়াবহ রূপ ধারণ করুক না কেন, তারা পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত চাহিদাকে রোধ করার কথা ভাবতে পারে না। তাই করোনা আপাতত বিদায় নিলে স্পেন, আয়ারল্যান্ড আবার লাইনেই ফিরে আসবে। জনসনের মুখে থ্যাচারের বুলি ফিরে আসবে।

বস্তুত, করোনা অতিমারির ভয়াবহতা অন্তত একটি সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করছে যে পুঁজিবাদের মধ্যে জনস্বাস্থ্যের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে একের পর এক ভাইরাস-ব্যাক্টেরিয়ার মারণ-সংক্রমণ প্রতিরোধের কোনও রাস্তা নেই। একদিকে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি এবং অন্যদিকে জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্র, মানুষের জীবন এক অসমাধানযোগ্য দ্বন্দ্বের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই দ্বন্দ্বের সমাধানে স্বাস্থ্য সহ সমস্ত পরিষেবা ও উৎপাদিকা শক্তিগুলির উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা এবং পরিকল্পিত উৎপাদন ও বণ্টনই একমাত্র পথ – যা হল সমাজতন্ত্র।

সূত্র:

১। ১৩.০৬.২০, টাইমস অব ইন্ডিয়া।

২। ১২.০৬.২০, https://www.firstpost.com/health/second-wave-of-covid-19-what-we-can-learn-from-1918-spanish-flu-and-why-caution-fatigue-is-biggest-challenge-8472261.html; ১৩.০৬.২০-এ সংগৃহীত।

৩। ১০.০৬.২০, https://mronline.org/2020/06/10/dossier-20-health-is-a-political-choice/; ১১.০৬.২০-এ সংগৃহীত।

৪। ১৮.০৩.১৯, https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2019/; ২৮.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

৫। ১৮.০৬.১৯, https://www.who.int/news-room/detail/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-unicef-who; ২৮.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

৬। ২২.০৩.২০, https://scroll.in/article/956777/washing-hands-is-key-to-containing-coronavirus-but-2-2-billion-people-lack-access-to-clean-water; ১৫.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

৭। ১৫.০৩.২০, https://www.business-standard.com/article/current-affairs/coronavirus-india-s-readiness-a-concern-due-to-shortage-of-beds-drugs-120031401127_1.html; ৩০.০৩.২০-এ সংগৃহীত।

৮। ৩০.০৪.২০, https://science.thewire.in/health/coronavirus-hand-wash-water/; ০১.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

৯। ০৭.০১.১৯, https://www.indiaspend.com/after-4-years-of-swachh-bharat-open-defecation-down-26-percentage-points-but-toilet-use-does-not-match-construction-spree-false-claims-evident/; ৩০.০৩.২০-এ সংগৃহীত।

১০। ১২.১০.১৩, https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/census-2011-missed-5-crore-slum-dwellers/articleshow/24025536.cms?from=mdr; ৩০.০৩.২০-এ সংগৃহীত।

১১। ২২.০৫.২০, https://theprint.in/india/dharavi-is-not-just-fighting-coronavirus-but-also-dirty-toilets-and-battered-image/426523/; ১৩.০৬.২০-এ সংগৃহীত। ২৫.০৫.২০, https://www.livemint.com/opinion/online-views/covid-s-spread-in-mumbai-s-slums-is-a-warning-for-all-cities-11590419925759.html; ১৩.০৬.২০-এ সংগৃহীত।

১২। ৩০.০৪.২০, আনন্দবাজার পত্রিকা।

১৩। ২৮.০৫.২০, https://thewire.in/health/the-covid-19-crisis-should-prompt-us-to-course-correct-and-focus-on-public-healthcare; ০১.০৬.২০-এ সংগৃহীত।

১৪। ২৯.০১.১৭, https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/healthcare/india-spends-less-than-brics-saarc-nations-on-health/articleshow/56848698.cms; ০৬.০৬.২০-এ সংগৃহীত।

১৫। ৩০.০৫.২০, https://www.epw.in/journal/2020/22/commentary/role-private-sector-escalating-medical-inflation.html; ০৫.০৬.২০-এ সংগৃহীত।

১৬। ২৯.০৫.২০, https://countercurrents.org/2020/05/out-of-pocket-healthcare-expenditure-covid-19-and-impoverishment-in-india/; ৩১.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

১৭। সূত্র ১৫ দ্রষ্টব্য।

১৮। সূত্র ১৬ দ্রষ্টব্য।

১৯। সূত্র ১৩ দ্রষ্টব্য।

২০। ১৪.০৪.১৯, https://health.economictimes.indiatimes.com/news/industry/india-facing-shortage-of-600000-doctors-2-million-nurses-study/68876861; ৩০.০৩.২০-এ সংগৃহীত।

২১। ০৩.০৪.২০, https://www.thehindubusinessline.com/economy/policy/bharat-grossly-unprepared-to-tackle-covid-19/article31240384.ece; ৩০.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

২২। ১০.০৬.২০, https://scroll.in/article/964262/30-million-people-one-coronavirus-testing-lab-crisis-in-eastern-uttar-pradesh; ১৩.০৬.২০-এ সংগৃহীত।

২৩। ২২.০৫.২০, https://www.counterview.net/2020/05/will-govt-of-india-icmr-end-perverse.html; ২৫.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

২৪। ২২.০৫.২০, https://theprint.in/health/india-ranks-low-on-covid-testing-but-has-done-well-on-number-of-infections-and-deaths/426253/; ১৩.০৬.২০-এ সংগৃহীত।

২৫। ১৩.০৬.২০, https://timesofindia.indiatimes.com/india/testing-levels-reducing-in-many-states-when-positivity-rates-up/articleshow/76349590.cms; ১৩.০৬.২০-এ সংগৃহীত।

২৬। হাওয়ার্ড ওয়েটজকিন ও রেবেকা জ্যাসো-অ্যাগুইলার, 'ইমপিরিয়ালিজম'স হেল্থ কম্পোনেন্ট', মান্থলি রিভিউ, জুলাই-আগস্ট ২০১৫।

২৭। হাওয়ার্ড ওয়েটজকিন ও ইডা হেলেন্ডার: 'দ্য নিওলিবেরাল মডেল কামস হোম টু রুস্ট ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস—ইফ উই লেট ইট', মান্থলি রিভিউ, মে ২০১৬।

২৮। হাওয়ার্ড ওয়েটজকিন ও সেলিয়া ইরিয়াত, 'হাউ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস এক্সপোর্টস ম্যানেজড কেয়ার টু থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিজ', মান্থলি রিভিউ, মে ২০০০।

২৯। ২৩.০৪.১৯, https://www.wsws.org/en/articles/2019/04/23/nhsp-a23.html; ৩০.০৫.২০-এ সংগৃহীত। ১৯.১১.১৯, https://www.jacobinmag.com/2019/11/nhs-national-health-service-tory-conservative-party-privatization-privatisation; ৩০.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

৩০। ২২.০৫.১৮, https://www.theguardian.com/society/2018/may/22/hospitals-struggling-to-afford-new-equipment-after-nhs-budget-cuts; ৩০.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

৩১। ২৪.০৩.২০, https://www.marxist.com/pandemics-profiteering-and-big-pharma-how-capitalism-plagues-public-health.htm; ১৫.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

৩২। সূত্র ৩ দ্রষ্টব্য।

৩৩। সূত্র ১৫ দ্রষ্টব্য।

৩৪। ১৯.০৭.১৭, https://scroll.in/pulse/844272/niti-aayog-and-health-ministry-prepare-model-contract-for-privatising-urban-health-care; ০৬.০৬.২০-এ সংগৃহীত।

৩৫। ০২.০১.২০, https://www.newindianexpress.com/nation/2020/jan/02/niti-aayog-unveils-plan-on-takeover-of-district-government-hospitals-by-private-players-2083954.html; ০৬.০৬.২০-এ সংগৃহীত।

৩৬। ০৬.০৯.১৭, https://scroll.in/pulse/849632/privatising-district-hospitals-niti-aayog-sidelined-health-ministry-for-world-banks-advice; ০৬.০৬.২০-এ সংগৃহীত।

৩৭। https://www.apmresearchlab.org/covid/deaths-by-race; ১৮.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

৩৮। ০১.০৫.২০, https://in.reuters.com/article/health-coronavirus-britain-ethnicity/uk-ethnic-minorities-suffer-extra-covid-deaths-think-tank-idINKBN22D47I; ১৮.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

৩৯। সূত্র ৩৭ দ্রষ্টব্য।

৪০। ১৫.০৩.২০, https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/15/america-public-health-system-coronavirus-trump; ০১.০৬.২০-এ সংগৃহীত।
৪১। ১২.০৪.২০, https://www.newsclick.in/COVID-19-Crisis-Brings-to-Light-the-Need-for-a-Much-Stronger-Public-Sector; ০১.০৬.২০-এ সংগৃহীত।

যোগাযোগ: suvro.mallick2@gmail.com